International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.131-140
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.131-140

তারাশঙ্করের সাহিত্যে অসহায় এক নারী: প্রেক্ষিত ডাইনী ও ডাইনীর বাঁশি

তৃপ্তি দাস

স্টেট এডেড কলেজ টিচার (স্যাক্ট-১), বীরভূম মহাবিদ্যালয়, সিউড়ি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Tarashankar Bandyopadhyay was one of the most popular and influential writers of Bengali *literature in the 20th century. He wrote novels, short stories, poetry and drama. He wrote three stories about Swarno. Two of the three stories were published under the tittle 'Daini' and another story published under the tittle 'Dainis flute'.*

Soradhoni is the main character in the story of 'Daini'. She was an orphan. One day she saw her own shadow in the water. Suddenly, Haru Sarkar said that his son fell sick due to Soradhonis evil look. Hearing this, soradhoni got puzzled. She prayed to god for the boy's recovery, and to take the evil look back. Then the strangest thing happened. The boy vomited twice and recovered. After that everyone started considering her as a witch. After the death of savitri's son, she left the village in disgrace. She also blamed herself for her husbsnd's death. After being insulted by neighbors, she left Bolpur and started to live in chati fathar math. But she could not stay there. Every one blamed her for the death of a Bauri boy. She left home fearing to be assulted again and she died in a kalbaisakhi storm.

Swarno is the main character of the 'Witch's Flute' story. This lonely women earns her living by selling vegetables. She provides favorite things for young women and children. But some people like Manoda forcefully promote her as witch. In the end, she started thinking of herself as witch.

Keyword: Daini, Popular, Neighbors, flute, kalbaisakhi, evil look, vegetables.

বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন বীরভূমের লাভপুরে। তাঁর বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র জমিদার। তাদের কাছারি বাড়ি বা বৈঠকখানার সংলগ্ন বড় পুকুরের উত্তর পূর্ব কোনে একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে ছোট্ট মাটির ঘরে বাস করতো গন্ধবণিকদের মেয়ে স্বর্ণ। কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'ডাইনী' গল্পের সূচনায় বলেছেন ---

> ''আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাড়ির পূর্ব প্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড় তাল গাছে ঘেরা। তাদের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনির ঘর।''[১]

সে পিতৃমাতৃহীন, স্বামীহীনা, নিঃসঙ্গ এক নারী। তাই জীবনধারণের জন্য বেঁছে নিয়েছিল সবজি বিক্রিকে। ছোটবেলা থেকেই কিশোর তারাশঙ্কর স্বর্ণের সম্পর্কে নানান ভয়ঙ্কর কথা শুনেছেন, পিসিমা শৈলজা ঠাকরুনের কথামতো তাই স্বর্ণকে এড়িয়ে চলতেন তিনি। কিন্তু একটা বয়সে এসে তাঁর ভয় ভেঙেছিল। তাঁর নিজের ভাষায় ---

> ''স্বর্ণ আসতো এরপর আমাদের বাড়ি। আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়াই বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ পৃথিবী পরিত্যক্ত স্বর্ণ।''[২]

তিনি স্বর্ণকে যত কাছ থেকে দেখেছেন তত তার ব্যথা বেদনা অনুভব করেছেন। তাই স্বর্ণকে নিয়ে তিনটি গল্প রচনা করেছেন তিনি। প্রথমটি প্রকাশিত হয় 'ডাইনীর বাঁশি' শিরোনামে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। পরের দুটি গল্পই 'ডাইনী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একটি গল্প এবং ১৯৫১ সালে 'মৌচাক' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় অন্য গল্পটি। 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পটি পরে 'ছলনাময়ী' গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বর্ণকে নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের দ্বিতীয় গল্প 'ডাইনী' পরে 'বেদেনী' গল্পগ্রন্থে স্থান পায়। 'ডাইনী' শিরোনামে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্পের একটিতে সরাসরি স্বর্ণের নামের উল্লেখ থাকলেও অন্য গল্পটিতে তার নাম হয়েছে সোরধনি। যদিও তিনটি গল্পে উঠে এসেছে একজন নারীর অসহায়তার কথা।

কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ডাইনী' গল্পে তুলে ধরেছেন এক মানহীনা নারীকে, যার নাম সোরধনি, ডাক নাম সরা।সে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা। স্বভাবতই সে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন ধারণ করে। ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসেবে বেঁছে নেওয়া কিশোরী মেয়েটি প্রকৃতি রূপের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বেড়ায়। এরকম কোন এক সকালে সোরধনি দুর্গা সায়রের ভাঙ্গা রানার উপর দাঁড়িয়ে দেখছিল তার ছবি উল্টো হয়ে জলে পড়ছে, আর সেই ছবি জলের ঢেউ-এ এঁকে বেঁকে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এরকম এক সময়ে তার জীবনে ঘটে যায় বিপর্যয়। বামুনবাড়ির হারু সরকার তার চুলের মুঠি ধরে তাকে আঁচড়ে ফেলে বলে---

> ''হারামজাদী ডাইনী তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছো? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলবো হারামজাদীকে?''[৩]

এক বাটি মুড়ি আর একটি আম সোরধনিকে সহজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সে সকলের চোখে হয়ে যায় ডাইনী। মুখে মুখে রটে যায় হারু ঠাকুরের ছেলেকে আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে সরা নজর দিয়েছে। সেই ছেলে এখন পেট যন্ত্রণায় অস্থির। তার নিজের নামে এই মিথ্যা অভিযোগ শুনে সে ভয়ে বিহ্বল হয়ে যায়। হারু ঠাকুরের ঘরে গিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে মনে মনে বলতে থাকে ---

> ''হে ঠাকুর, ভালো করে দাও, ওকে ভালো করে দাও! ... দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি , এই লইলাম!''[৪]

কিছুক্ষণ পর বার দুই বমি করে ছেলেটি সুস্থ হয়ে যায়; আর ডাইনী অপবাদ অক্ষয় হয় সোরধনির।লজ্জায় অপমানে সে আর কারো বাড়ির দাওয়াই শুতে সাহস পায় না। গ্রামের বাইরে বুড়ো শিবতলার ভাঙ্গা মন্দিরে শুয়ে সমস্ত রাত্রি অঝর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে দেবতার কাছে মিনতি জানায়---

"হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টি ভালো করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও।"[৫]

কিন্তু তার এই প্রার্থনায় দেবতারা কর্ণপাত করেননি। সোরধনি মনে হয় এ হয়তো তার পূর্ব জন্মের পাপ। পূর্ব জন্মের কর্মফলকে খন্ডন করার সাধ্য হয়তো ভগবানেরও নেই। সোরধনি ভেবে পায়না তার নামের সঙ্গে ডাইনী অপবাদ কেন জড়িয়ে গেল। অথচ এক্ষেত্রে তার কোনো কিছু করার নেই ---

> "আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছে করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারলে সে পরিত্রাণ পায়।"[৬]

তাই প্রচন্ড গ্রীষ্মের দুপুরে ছাতি ফাটার মাঠে পথ হারিয়ে যুবতী মেয়েটি যখন তার নধর পুষ্ট শিশুটিকে নিয়ে সোরধনির কাছে উপস্থিত হয়, তখন সে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও পরম মমতায় বাড়িয়ে দেয় পাটালি গুড় সহ এক ঘটি জল। কিন্তু এরপরই নজর পরে শিশুদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় শিশুটির শরীরের সমস্ত রস সে যেন পান করছে। তাই সে আত্মচিৎকারে ফেটে পড়ে ---

> "খেয়ে ফেললাম! -- ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে! পালা পালা ---- তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি!"[৭]

নিজেকে সে নিজেই ধিক্কার দেয় -----'ছি ছি ছি'। তার নিজের উপর নিজের এই অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল বহু বছর আগে গ্রামের বাল্যসখী সাবিত্রীর ছেলেকে কেন্দ্র করে। সদ্য প্রসবা সাবিত্রী ছেলেটিকে একটা কাঁথায় শুইয়ে দিয়ে ক্লান্ত শরীরে রোদ পোহাচ্ছিল। সেই সময় সরা সেখানো উপস্থিত হয়। বাল্য সখীর ছেলেকে দেখে খুব আনন্দ হয় তার। বুকে চেপে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করে। এমন সুন্দর মুহূর্তকে কালি ঢেলে দিয়ে সাবিত্রীর শাশুড়ি সাবিত্রীকে ঝংকার দেয়---

"বলি ওলো --- ও আক্কেলখাগী হারামজাদী ।খুব যে ভাবী--সাবীর সঙ্গে মশকরা জুড়েছিস। আমার বাছার যদি কিছু হয়, তবে তোকে বুঝবো আমি -- হ্যাঁ।"[৮]

এখানেই ক্ষান্ত হয়নি সাবিত্রীর শাশুড়ি, বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে সোরধনিকে বলেছে ---

"বেরো বলছি বেরো! হারামজাদীর চোখ দেখো দেখি!"[৯]

এমন অপমানে মর্মান্তিক ভাবে আহত হয়েছিল সোরধনি। পথে যেতে যেতে বারবার তার মনে হয়েছিল—

"ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলেই বা সে ডাইনী, ---- কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করতে পারে? ছি ছি।"[১০]

এরপর সে স্মরণ নিয়েছিল ভগবানের---

> "তুমি ইহার বিচার করবে। একশো বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে! দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালোবাসি।"[১১]

কিন্তু অপরাহ্ন বেলায় সোরধনির বিশ্বাসে চির ধরিয়ে মারা যায় সাবিত্রীর খোকা। সেই দিন লোক লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেতে গ্রাম ছাড়ে সোরধনি।

রাতের অন্ধকারে হাঁটতে-হাঁটতে নিঃসঙ্গ সোরধনি একসময় পৌঁছে যায় বোলপুরে। সেখানে এক জওয়ান পুরুষ ভালোবেসে ঘরে তুলেছিল তাকে। সেই জোয়ান পুরুষটিকে ভালোবেসে মনের মত সংসার সাজিয়েছিল সরা। পারস্পরিক অনুরাগে সেই সংসার হয়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই সুখ চিরস্থায়ী হয়নি। লোহার কলে কয়লা ঠেলার মতো শক্তিশালী পুরুষটি মাছের কাঁটার মত মাংস শূন্য হয়ে যায়। অধিক পরিশ্রম এই অসুস্থতার জন্য দায়ী। কিন্তু সংশয়ী সোরধনি ভেবে বসে তার দৃষ্টিতে শুকিয়ে গেল তার স্বামী। সকলের চেয়ে শক্তিশালী, পরিশ্রমী, জোয়ান পুরুষটির সমস্ত রক্ত সে কি পান করে ফেলল? তার বিষদৃষ্টিতে কি শুকিয়ে গেল তার স্বামীর প্রাণ রস? একদিন চরম হতাশায় সে তার আশঙ্কার কথা বলে ফেলল প্রতিবেশী এক মহিলাকে। ফলে আবার তাকে নামতে হলো পথে।

ছাতি ফাটার মাঠের পূর্বপাড়ে যে আম বাগান, সেখানে এক কোণে একখানি মাটির ঘরে বাস করে সোরধনি। এখানকার লোকের বিশ্বাস এক মহানগরের বিশেষ জ্বালায় এই ছাতি ফাটার মাঠ সমস্ত উর্বরতা শক্তি হারায়। সেই বিষের জ্বালায় মাঠ খানির রসময় রূপ, বীজ প্রসবিনী শক্তি পুড়ে ক্ষার হয়ে যায়। এত বড় মাঠে কোন বড় গাছ জন্মায় না। কেবল খৈরী ও সোয়াকুল জাতীয় কন্টক গুল্ম জন্মায়। সেই মহানাগ আর না থাকলেও তার বিষ জর্জরতা এখনো কমে নাই। তার কারণ এক ডাইনী তিন-চার খানা গ্রাম ধ্বংস করে আকাশ পথে গাছ চালিয়ে যেতে যেতে এই ছাতি ফাটার মাঠের নির্জনতায় মুগ্ধ হয়ে এখানে বসবাস শুরু করে। সে মানুষকে পরিহার করে চললেও মানুষ সভয়ে লক্ষ্য করে তার দৃষ্টি অপলক স্থির। গ্রামের মানুষের ধারণা যে ভ্রান্ত নয় তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কারণ গাছ চালিয়ে নয়, স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিবেশীদের দ্বারা চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে তাকে ঘর ছাড়তে হয়েছিল। এরপর নগর বাহিরে মনুষ্যহীন ছাতি ফাটার মাঠে সে বসতি গড়েছিল মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণায়। তবে সে মানব বিদ্বেষী হয়ে সমস্ত মানবিক গুনকে বিসর্জন দেয়নি। কারণ তার মনে ছিল প্রেম। তাই বাউরিদের উচ্ছল মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির প্রেমের কথা জানতে পেরে তার স্মৃতিতে উঠে এসেছে প্রথম প্রেমের স্পর্শ। প্রেমিক পুরুষটির বলা আর না বলা কথা ভিড় করেছে তার মনে। এই বৃদ্ধ বয়সেও অকারণ আবেগে সে পুলকিত হয়ে উঠেছে, অকারণ লজ্জায় রাঙা হয়েছে কপোল। তাই উচ্ছল মেয়েটি যখন দশটি টাকা আর একজোড়া রুপোর চুরির জন্য প্রেমকে অস্বীকার করে বলেছে---

> ‘‘উ হবে না। আমাকে রুপোর চুরি গড়িয়ে না দিলে তোর কোন কথা আমি শুনবো না। আর আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে, তবে আমি যাব। লইলে বিদেশে পয়সা অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।’’[১২]

মেয়েটির এই কথা শুনে তার প্রেমিকা সত্ত্বা তীব্র ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছে ---

> ‘‘ছি ছি! মেয়েটার মুখে ঝাটা মারতে হয়! এতো বড়ো একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া পরার অভাব হয় কোনদিন! মরণ তোমার! রূপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখা -বাঁধা উঠবে তোমার হাতে! ছি !’’[১৩]

এরপরই তার মনে পড়ে ছেলেটির অসহায়তা। ছেলেটি এবার হয়তো বিবাগী হয়ে বেড়িয়ে যাবে। কিম্বা গলায় দড়ি দিয়ে এই ভালোবাসাহীন জগৎকে বিদায় জানাবে। এইসব চিন্তায় সে শিহরিত হয়। তার মনে হয়, ছেলেটির নবীন বয়স, সুখের সময়। এইসব ভাবনা থেকেই নিজের শেষ সম্বলটুকুও সে তুলে দিতে চায় ছেলেটির হাতে। নাতি - ঠাকুমার সম্পর্ক পাতিয়ে কয়েকটা চোখা চোখা রসিকতা করে পেতে চায়

অপার আনন্দ। আর সমাজের মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে গাঁথতে চায় বিনি সুতোর মালা। সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়, সমাজবদ্ধ জীব হয়ে বাঁচতে চায় সে। তাই নিজের প্রেমের চিহ্ন, প্রিয় মানুষের স্মতি দু গাছা রুপার চুড়ি এবং অন্তিম জীবনের শেষ সম্বল কয়েকটা টাকা নিয়ে বাউড়ীদের ছেলেটার কাছে এসে হাসতে হাসতে বলেছে ---

> ''বলি, ওহে লাগর শুনছো?''[১৪]

জীবনের শেষ সম্বলটুকু দিতে গিয়েছিল বৃদ্ধা। চেয়েছিল নবীন জীবনে ভীড় করুক নানান স্বপ্ন। কারন তার প্রেমিক পুরুষটি তাকে রেখে অকালে পাড়ি দিয়েছে অজানালোকে। তাই স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা সে জানে। এই কারনে সে চায় না আর কোন প্রেম ভেঙ্গে যাক, হারিয়ে যাক প্রিয় মানুষ। কিন্তু এতো ভাবনা চিন্তা করে বৃদ্ধা যখনই বাউড়ীদের ছেলেটার কাছে গেল তখন ছেলেটি ভয়ে আরষ্ট হয়ে চমকে উঠলো, ছুটে পালাতে গিয়ে পা বিঁধালো হাড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো রক্তক্ষরণ, সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর। এমন একটা জোয়ান মরদের ভয় দেখে রাগে অস্থির হয়ে উঠলো বৃদ্ধা। তার মনের কোমলতা বিনষ্ট হয়ে জেগে উঠলো দানবীয় সত্ত্বা। তাই বলে উঠলো ---

> ''মর মর ---- তুই মর।সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষনে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নি:শেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।''[১৫]

গ্রামের মানুষ কোন কালেই কার্য- কারন সূত্রে কোন কিছু বাঁধেনি। কারন তাদের মনের গহনে জমা থাকা আদিম বিশ্বাস সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় তারা। ভূত - প্রেত - ডাইনী- ডাকিনী প্রভৃতি নিয়েই তারা চলতে থাকে। আর তাদের এই ভ্রান্তি দূর করতে কাউকে জীবন দিয়ে মূল্য বোঝাতে হয়। 'ডাইনী' গল্পেও পরিস্থিতির চাপে সোরধনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে ডাইনী। হারু সরকারের ছেলের পেট ব্যাথার নানা কারন থাকতে পারে। সেই কারন না খুঁজে একটি কিশোরী মেয়েকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ডাইনী নামে দেগে দেওয়া হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়,পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকাটির পাশে কোনশুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ দাঁড়াল না। উপরন্তু, গ্রামের মানুষ এই মিথ্যা অপবাদটিকে বিশ্বাস করলো। তাই বাল্য সখী সাবিত্রীর ছেলেকে সে যখন বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চাইলো, তখন তার ভাগ্যে জুটলো লাঞ্ছনা। সাবিত্রীর ছেলেটি মারা গেছে। তার মৃত্যুর কারন হয়তো ধনুষ্টংকার। কিন্তু গ্রামের সকলে, এমনকি সোরধনি নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করলো তার নজর দোষে সাবিত্রীর খোকা মারা গেছে। এই ঘটনা সোরধনির জীবনে গভীর প্রভাব ফেলল। সে ভাবতে শুরু করল তার যাকে ভালো লাগবে তারই হয়তো অনিষ্ট হবে। নিজের ভালোলাগাকে ভয় করতে শুরু করলো বলেই বোলপুরে যখন জোয়ান পুরুষটি তাকে জিজ্ঞাসা করল সে বিয়ে করেনি কেন, তখন সে শিহরিয়া হয়ে উঠলো। অবাক নয়নে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল---

> ''তাহাকে---- তাহার মতো ডাইনিকে, ---- কে বিবাহ করবে? ''[১৬]

এসব ভাবলেও মুখ ফুটে বলতে পারেনি কিছু। লোকটি যখন অনুরাগ মেশানো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে ---

''আমাকে বিয়ে করবি সরা? ... এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অ্যানেক। তা, জাতে পতিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তুই আমাকে বিয়ে করবি? ''[১৭]

তখন আশায় বুক বেঁধে সংসার পেতেছিল সে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তার প্রেমিক পুরুষটি অকালে বিদায় নিয়েছিল। সরার সংশয়ী মন ভাবল সে তাকে খেয়ে ফেলেছে। তাই বাউড়ীদের ছেলেটি যখন বৃদ্ধাকে দেখে ছুটে পালাতে গিয়ে পায়ে হাড় বিধিয়েও কোন চিকিৎসা করাইনি তখন তার যে টিটিনাস হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু পরদিন সকালে রটে গেল ---

> ''সর্বনাশী ডাইনী বাউড়ীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়েছিল ঐ ঝরনার ধারে; মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মত জানিতে পারিয়া নিঃশব্দ পদ - সঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে; অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার পরই প্রবল জ্বর; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মতো বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে!''[১৮]

ছেলেটির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তার বাড়ির লোক এক গুনিনকে নিয়ে এসেছে। গুনিন আশ্বাস দিয়েছে যে, সে রাক্ষসীকে জব্দ করবে। গুনিনের আস্ফালন শুনে সরার মনে হয়েছে ---

''যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিত, কোনদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুনীনটা!''[১৯]

এসব ভাবলেও নানান এলোমেলো চিন্তা তার মাথায় ভিড় করে। চিন্তায় ভাবনায় তার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হয়। তার মনে হয় সে বোধহয় দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। সে ভাবে গুনীনটা হয়তো তাকে প্রহারে প্রহারে জর্জর করছে। সে স্থির করে এবার এখান থেকে সে পালিয়ে যাবে, নয়তো বোলপুরের মতো এখানেও গ্রামবাসীরা তাকে হেনস্থা করবে। এমন সময় উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটি উচ্চ কান্নার রোল আচমকা ছড়িয়ে পড়ে। বৃদ্ধা স্তব্ধ হয়ে শুনে পাগলের মত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘন অন্ধকার যখন সব কিছুকে আবছা করে দেয় তখন সে পথে নামে। পথ চলতে চলতে সে ভাবে---

''কত জায়গায় যে সে ফিরিল! আবার যে কোথায় যাইবে!''[২০]

জীবনের অনিশ্চয়তা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে সে দিশাহারা হয়ে যায়; আর জীবনের চরম অসহায় মুহূর্তে তার মানসপটে উদ্ভাসিত হয় তার প্রেমিক তথা স্বামীর ছবি। সে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে---

> ''ওগো, তুমি ফিরে এস গো!''[২১]

ক্লান্ত অবসন্ন পদক্ষেপে চলতে চলতে একসময় তাকে থামতে হয়। কারণ আর হাটবার সামর্থ্য তার নেই। এর মধ্যে আকস্মাৎ ধেয়ে আসে কালবৈশাখী। বিধ্বংসী ঝড় সব কিছুকে লন্ডভন্ড করে দেয়। লেখকের বর্ণনায় ----

> ''পরদিন সকালে ছাতি - ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা কাঁটা ডালের সূচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ পথে যাইতে যাইতে ওই গুণীনের মন্ত্র

> প্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মতো পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নিচে ছাতি - ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনির কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।''[২২]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পে দেখতে পাই গন্ধবণিকদের মেয়ে স্বর্ণ, গ্রাম-গ্রামান্তরের হাটে সবজি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে। মাতৃহীন স্বর্ণকে পাড়া পড়শীদের বাড়িতে রেখে গ্রাম- গ্রামান্তরে বাড়ি বাড়ি সবজি বেঁচে বেড়াতো তার বাবা। কিন্তু স্বর্ণ বাড়ি বাড়ি যেতে পারে না, কারণ তার মা ছিল ডাইনি। পাঁচ বছর বয়সে মাতৃহীন স্বর্ণের মাকে মনে না পড়লেও মাকে নিয়ে লোকে তাকে দশ কথা বলতে ছাড়ে না। পাতানো দিদি সৈরভীর নাতি টুকুকে বড় আদর করে স্বর্ণ। সেই ভালোবাসার টানে টুকু ছুটে আসে স্বর্ণের কাছে, রোজ নিত্যনতুন বায়না তার। এই কারনে মানদা ছেলেকে ভৎর্সনা ও প্রহার করতে ছাড়ে না ---

> ''মুখপোড়া দস্যি, আবার তুমি স্বন্নর বাড়ি গিয়েছিলে? বারবার বারণ করি না হতভাগা, যাসনে ডাইনির বাড়ি!''[২৩]

মানুর কাছে কোন প্রমাণ নেই যে স্বর্ণ ডাইনী। তবুও মানু বারবার স্বর্ণকে অপবাদ দেয়। তার মা প্রতিবাদ করলে সে ঝংকার দিয়ে বলে ---

> ''ওর মা ডাইনী ছিল না? ... নিম গাছে নিম ফলই হয় মা, চিনির ডেলা ধরে না।''[২৪]

মানুর কথার প্রতিবাদ করতে পারতো স্বর্ণ, কিন্তু এই অপমান রোজই কারোর না কারোর কাছে তাকে ভোগ করতে হয়। আর এভাবেই ম্লান হেসে সেখান থেকে বিদায় নেয় সে। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ---

> ''আমার আবার মান - মর্যাদা! ভগবানই যার মান রাখলেন না, তার মান কি মানুষে রাখতে পারে? না --- রাখতে গেলে থাকে? পাঁচ বছর বয়সে যার মা যায়, এগারো বছরে যে বিধবা হয়, আঠারো বছরে যার বাপ মরে, --- তার আবার মর্যাদা!''[২৫]

জীবনের দুঃখ- দুর্দশা, অভাব -অভিযোগ, লাঞ্ছনা -অপমান তার গা সওয়া হয়ে গেছে। এত কিছুর মধ্যেও যখন গাঙ্গুলীদের ছোট বউ মিষ্টি হেসে 'মাসি' বলে ডাকে তখন তার মন ভরে যায়। সরকার বাড়ির ছোট বউ, ঘোষেদের মেয়ের মত কচিকাচাদের ছোট্ট ছোট্ট আবদার পূরণ করতে পেরেই সে খুশি। কিন্তু মাঝে মাঝে সে শিহরিত হয় এটা ভেবে যে তার মায়ের প্রবৃত্তি যদি তার মধ্যে থাকে! সেটা যদি সহসা তার মধ্যে জেগে ওঠে!

টুকুর মা মানদা যেন স্বর্ণকে ডাইনি প্রতিপন্ন করার প্রতিজ্ঞা করেছে। তাই বয়সের অভিজ্ঞতায় স্বর্ণ যখন মুখার্জি বৌ-এর অসুস্থতার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছে তখন মানদা বলে উঠেছে---

''মাসি কি ডাইনী না কি? তাই পোয়াতীর পেটের ভিতর মরা ছেলে সব দেখতে পেলে?''[২৬]

এরপরই অপ্রস্তুত, অসুস্থ এবং বিধ্বস্ত স্বর্ণের সামনে সে শুরু করে নতুন গল্প -------

> ''আমার শ্বশুর বাড়িতে এক ডাইনী ছিল---- শুনেছি, সে নাকি সব দেখতে পেতো। মানুষের বুকের ভিতর প্রাণে নড়ছে, শিরার মধ্যে রক্ত চলছে, পোয়াতীর পেটের ভেতর ছেলে, গাছের ফুলের মধ্যে ফল ---- সব সে দেখতে পেতো।''[২৭]

মানুর বলা কথাগুলো স্বর্ণের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয় । তার মনের মধ্যে তীব্র দোলাচলতা সৃষ্টি করে। ক্ষণে ক্ষণে তার শরীর শিহরিত হয়। মানদার বলা ডাইনির সঙ্গে সে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। লেখকের বর্ণনায় ----

> ''স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল।ও কি? তালগাছটার উদ্গামোদ্যত ফলভার যেন সে দেখিতে পাইতেছে ! ভালো করিয়া চোখ মুছিয়া আবার সে চাহিলো।। সত্যসত্যই তো তালগাছটির ভাবী ফলসম্ভারের সূচনা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে!''[২৮]

কিছুক্ষণ পর টুকু এসে যখন তাকে জড়িয়ে ধরল, চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে তার রাগ ভাঙালো, তখন স্বর্ণের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল। গভীর আবেশে টুকুকে বুকে চেপে ধরে বলল---

> ''ওরে আমি নাকি ডাইনী, --- ডাইনী! ছেলে ভালোবাসি আমি, পোয়াতী ভালোবাসি আমি, কি সব মিথ্যে কথা বলে এরা?''[২৯]

পরমুহূর্তে মানদার বলা কথা তার মনের ঘরে ভিড় করলো। মনে পড়ল সে ডাইনী। তাই টুকুকে দুই হাতে ঠেলে দিয়ে বলল ---

> ''পালা পালা --- টুকু; পালিয়ে যা তুই --- পালিয়ে যা।''[৩০]

আকস্মাৎ স্বর্ণ উন্মত্ত হয়ে ওঠে টুকুকে কঠিন পেষনে পিষ্ট করতে লাগলো। বলে উঠলো ---

> ''আমি ডাইনী, আমি কি করবো? আমার সামনে এলি কেন, এলি কেন তুই ? এই যে তোর দেহের লাল রক্ত আমি দেখতে পাচ্ছি।''[৩১]

কিন্তু এরপরই শিশুটি যখন এলিয়ে পড়ল তখন স্বর্ণের চমক ভাঙলো। শীতল বারি সিঞ্চনে টুকুকে সুস্থ করে চোরের মতো তাকে তাদের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে এলো।

মুখার্জিদের বউয়ের মৃত্যুর জন্য স্বর্ণকে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না। কারণ তখনো পর্যন্ত নিজেকে আর পাঁচজনের মতোই সাধারণ মানুষ ভেবে এসেছে সে। লোকের দশ কথা কানে গেলেও সে তা মনে নেয় নি। কিন্তু মানদা বারবার তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছে। ছেলেকে নিজের কাছে ধরে রাখতে ব্যর্থ মানদার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছে স্বর্ণের উপর। এক কথায় বলা যায় মুখার্জি গিন্নি, মানদার মত মানুষরাই স্বর্ণকে ডাইনী বানিয়েছে। তাই 'ডাইনী' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-

> ''আমার বিশ- বাইশ বছর বয়স যখন হলো, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করতো---- সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ করে মনে মনে সে শিউরে উঠতো। কাউকে চোখে দেখে ভালো লাগলে চোখ বন্ধ করতো। তার আশঙ্কা হতো, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে; হয়ত বা খেয়ে ফেলেছে ভেবে শিউরেও উঠতো।''[৩২]

এই কারণেই হয়তো প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বের হতো না স্বর্ণ। চার দেওয়ালের মধ্যে সব সময় নিজেকে বন্দী রাখতো। লেখকের বর্ণনায় ---

> ‘‘নিজের ঘরে আধো- অন্ধকার আধো -আলোর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। চুপ করে বসে থাকতো। কারোও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত। ’’[৩৩]

ভারতবর্ষীয় সমাজ নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভুল ধারণা ও ভুল সিদ্ধান্ত। অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন মানুষের লুপ্ত হয় মানবিক বোধ। আকস্মিক বিপর্যয় ও মৃত্যুর কারণকে আয়ত্ত করতে কিংবা চিহ্নিত করতে না পেরে অজ্ঞ, কুসংস্কারাছন্ন মানুষ একজন রক্ত মাংসের মানুষকে ডাইনী হিসেবে দেগে দেয়; আর এই ডাইনী অপবাদের শিকার হয় সমাজের ব্রাত্য, অন্ত্যজ, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। এই ডাইনী অপবাদের আরোপ শুধু যে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে করা হয় তা নয়, অনেক সময় এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিস্বার্থ। লেখক ‘ডাইনী’ গল্পের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানবীর দারিদ্র, অসহায়ত্ব, সামাজিক অপবাদে বিপর্যস্ত জীবনকে তুলে ধরেছেন অসীম দক্ষতায়। দেখিয়েছেন কিভাবে একটি নির্দোষ মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। একের পর এক বর্ণনার মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন সমাজের মানুষের নানান অত্যাচার। এসব মানুষ তাকে ভিটে মাটি ছাড়া করেও ক্ষান্ত থাকছে না, তাকে মৃত্যুর পথে চালিত করে এমনকি তার মৃত্যু যজ্ঞের আয়োজন করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে। অথচ মানুষ যদি একটু মানবিকভাবে বিবেচনা করতো, একটু সুযোগ দিত, আকস্মিক কার্যের পিছনে সঠিক কারণ বিশ্লেষণ করতো, তাহলে বহু মানুষকে কুসংস্কারের যপকাষ্ঠে বলি হতে হতো না। সারা জীবন একটা মানুষকে মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে বাঁচতে হতো না। আমৃত্যু বয়ে বেড়াতে হতো না অপবাদের গ্লানি।

তথ্যসূত্র:

১.ডাইনী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খন্ড, সম্পাদনা -- অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ -- সেপ্টেম্বর ২০১৪,পৃষ্ঠা -১১৯
২. ঐ, পৃ.- ১২৩
৩.ডাইনী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদনা -- অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ-- জানুয়ারি ২০১৪,পৃষ্ঠা -২৪৪
৪. ঐ, পৃ.২৪৪।
৫. ঐ, পৃ.২৪৫
৬. ঐ, পৃ.২৪৭
৭. ঐ, পৃ.২৪৭
৮. ঐ, পৃ.২৪৭
৯. ঐ, পৃ.২৪৭
১০. ঐ, পৃ.২৪৭

১১. ঐ, পৃ.২৫১
১২. ঐ, পৃ.২৫১
১৩. ঐ, পৃ.২৫১
১৪. ঐ, পৃ.২৫১
১৫. ঐ, পৃ.২৫০
১৬. ঐ, পৃ.২৫১
১৭. ঐ, পৃ.২৫২
১৮. ঐ, পৃ.২৫২
১৯. ঐ, পৃ.২৫৩
২০. ঐ, পৃ.২৫৩
২১. ঐ, পৃ.২৫৩
২২.ডাইনীর বাঁশি, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খন্ড, সম্পাদনা -- অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর ২০১৪,পৃষ্ঠা -২২৭
২৩. ঐ, পৃ.২২৮
২৪. ঐ, পৃ.২২৬
২৫. ঐ, পৃ.২৩০
২৬. ঐ, পৃ.২৩০
২৭. ঐ, পৃ.২৩১
২৮. ঐ, পৃ.২৩১
২৯. ঐ, পৃ.২৩১
৩০. ঐ, পৃ.২৩১
৩১. ডাইনী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খন্ড, সম্পাদনা -- অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ -- সেপ্টেম্বর ২০১৪,পৃষ্ঠা -১২১
৩২. ঐ, পৃ.১২১

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আমার সাহিত্য জীবন -- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. আমার কালের কথা-- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

Website:
https:/nagorik.net/culture/literature/a-tarashankar-creation-carved-out-of-life./
Date -11/01/2024. Time - 4.00p.m